হালখাতা

১৪২৭ বঙ্গাব্দের সূচনায় ‘হরপ্পা’ নিবেদিত বৈদ্যুতিন পুস্তিকা

বাঙালি বারোমাসে তেরো পার্বণ নিয়ে সারাটা বছর শশব্যস্ত। পার্বণ মানেই উৎসব-উৎসাহ, পুজো-আচ্চা, বাজার-ব্যস্ততা, নিমন্ত্রণ-ভোজ—আরও কত কী! ইংরিজি সালতারিখের প্যাঁচপয়জারে আষ্ঠেপৃষ্ঠে নিজেকে সব সময়ই জড়িয়ে রাখার ফলে সেসব পার্বণের ঠিকঠাক বাংলা তারিখ আজ বাঙালির ঠোঁটস্থ নাহলেও বছর শুরুর উৎসবের দিনাঙ্ক সে যে সহজেই বলতে পারে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলার বছর শুরুর দিন, মানে পয়লা বৈশাখ। বাঙালিরা যে যেখানেই থাকুক না কেন নিজের মতো একটা উদ্‌যাপনের আমেজ উপভোগ করতে চায়। সকাল থেকেই লেগে যায় এক অদ্ভুত ব্যস্ততা। কেউ ছোটে বাজারে, কেউ মন্দিরে, কেউ-বা অন্য কাজে। ব্যবসায়ীরা সকাল-সকাল হাজির হয় মন্দিরে লাল রঙের কাপড়ে-বাঁধানো হালখাতার পুজো করাতে। ওই হালখাতা অনুয়ায়ী তাদের বছরভরের হিসেবপত্তর মিটিয়ে নিতে হবে খদ্দেরের সঙ্গে। পাওনাগণ্ডা মেটাতে খদ্দেররা হাজির হলে চলবে আদর-আপ্যায়ন, মিষ্টিমুখ, জমে উঠবে উৎসব—হিসেবকে ঘিরেই। তাই তো প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "নূতন বৎসরের প্রথম দিন অপর দেশের অপর জাতের পক্ষে আনন্দ-উৎসবের দিন। কিন্তু আমরা সেদিন চিনি শুধু হালখাতায়। বছরকার দিনে আমরা গত বৎসরের দেনাপাওনা লাভলোকসানের হিসেব নিকেশ করি, নূতন খাতা খুলি, এবং তার প্রথম পাতায় পুরাণো খাতার জের টেনে আনি।"

আসলে বছরের এই প্রথম দিনটি অতি পবিত্র দিন ভেবে দেববন্দনার মধ্যে দিয়ে খাতা পুজো ও হিসেবের নবীকরণের করে ব্যবসার গতিকে অব্যাহত রাখাটাই লক্ষ্য। এ কারণেই পয়লা বৈশাখে খেলার মাঠে ফুটবলের বার পুজো করে আসন্ন মরশুমের প্রস্তুতিতে গতি আনা হয়, সিনেপাড়ায় মহরতের ভিতর দিয়ে শুরু হত নতুন ছবি। একই রকমভাবে বইপাড়াতেও নববর্ষের মজলিশে লেখক-প্রকাশকদের আড্ডা জমে ওঠে, থাকে খাওয়াদাওয়া, আর লেখকদের হাতেও দেওয়া হয় কিছু পাওনা বা অগ্রিম অর্থ। আবার প্রকাশকদের কাগজ ব্যবসায়ীদের ও অন্যান্য পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এছাড়াও বইপাড়ায় পয়লা

বৈশাখের বিশেষ গুরুত্ব আছে, প্রত্যেক বছর এই দিনেই প্রকাশিত হয় অনেক নতুন বই। শোনা যায়, বিদ্যাসাগরমশাইয়ের *বর্ণপরিচয়*ও নাকি প্রকাশিত হয়েছিল পয়লা বৈশাখেই। তবে আগে শুধু বই নয় বৈশাখ মাসে আত্মপ্রকাশ করত বহু নতুন পত্রপত্রিকাও।

১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পয়লা বৈশাখ প্রকাশিত হল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সেকালের বহু নামি লেখক এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করল 'বঙ্গদর্শন'। প্রথম মুদ্রণের হাজার কপি দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় পত্রিকাটির পুনর্মুদ্রণ করতে হয়েছিল। সমালোচনা সত্ত্বেও পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে দিনেদিনে। মুদ্রণসংখ্যা শ্রাবণ সংখ্যায় পনেরোশো ও কার্তিক সংখ্যায় ষোলোশোয় পৌঁছয়। আর দুই বছরের মধ্যে গ্রাহকসংখ্যা দু-হাজার অতিক্রম করেছিল।

বঙ্গদর্শন।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড। ১লা বৈশাখ ১২৭৯। ১ সংখ্যা।

পত্র সূচনা।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির-জ্ঞান আছে, যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধি-হীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানা রূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যে রূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান; কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে

১২৯৬ সালে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ষোলো পৃষ্ঠার এক আনা মূল্যের মাসিকপত্র ‘সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার’।

সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার।

মাসিক পত্রিকা।

যতন করিলে রত্ন সর্ব্বত্রই মিলে,
ক্ষতিগ্রস্ত হই মোরা সুধু অবহেলে ;
জগত শিক্ষার স্থল,
প্রতি অণু নীতি বল,
বিবেকী নয়নে মাত্র করে গো প্রদান ;
মূঢ় যারা অশ্রদ্ধায় নাহি লভে জ্ঞান।

১ম ভাগ। | বৈশাখ, ১২৯৬। | ১ম সংখ্যা।

ভূমিকা ও সম্পাদকের নিবেদন।

কালের কৌতুকাবহ ক্রীড়াভূমিতে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিবসে সৌর-সংক্রমণে শুভলগ্নে “সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার” জন্ম গ্রহণ করিল। ভাণ্ডার যেরূপ নানাবিধ রত্নের আকর, অল্প উজ্জ্বল, মহোজ্জ্বল প্রভৃতি নানাবিধ রত্নে শোভিত বা পরিপূরিত থাকে, ইহাও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন উজ্জ্বলতার, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বহুবিধ সাহিত্য-রত্নরাজিতে সুশোভিত বা পরিপূরিত থাকিবে। স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার অনন্ত অম্বর যেরূপ ক্ষুদ্র, বৃহৎ উজ্জ্বল সুষমাধারী বহুবিধ দৃষ্টিসুখপ্রদ প্রভাপূর্ণ তারারত্নে দর্শকের মনোহরণ করে, এই “সাহিত্য-“রত্নভাণ্ডার” ও সেইরূপ বহুবিধ ভাবরঞ্জিত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধে পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে। ভুক্ত অন্ন যেরূপ মানবদিগের ক্ষুধানল নিবৃত্তি ও দেহের বলবত্তা সাধন রূপ দ্বিবিধ ক্রিয়া করে, ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করি, ইহাও সেইরূপ পাঠকবৃন্দের কৌতূহল তৃপ্তি বা আনন্দ প্রদান ও জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে ক্ষমবান্ হউক।

আমাদিগের সর্ব্বকার্য্যের আরম্ভে বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে স্মরণ ও প্রণাম

১২৯৭ সালে প্রকাশিত হয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ‘মাসিক পত্র ও সমালোচন’ ‘সাহিত্য’। শহর হোক কিংবা মফস্‌সল, পত্রিকাটির ডাকমাশুলসহ অগ্রিম মূল্য ছিল ‘দুই টাকা মাত্র’।

সাহিত্য।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম ভাগ। } বৈশাখ, ১২৯৭। { ১ম সংখ্যা।

সূচনা।

বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবার জন্য, “সাহিত্যের” জন্ম হইল। জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

এদেশে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব, দিন দিন অধিকতররূপে বিস্তারিত হইতেছে। এই শিক্ষার ফলে, আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ, নানাবিধ নূতন ভাব ও অভিনব চিন্তার সহিত পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই, আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য, তাঁহাদের সেই চিন্তাশক্তি ও ভাবুকতার ফললাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এখন যাঁহারা ইংরাজী শেখেন, তাঁহারা প্রায় বাঙ্গলা পড়েন না; বাঙ্গলা লেখেন না। বাঙ্গলা-সাহিত্যের শৈশব-দশায়, যাঁহারা বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন, এখনও প্রায় তাঁহারাই বাঙ্গলা-লেখক। তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কে তাহাতে জল সেচন করিবে? তাঁহারা যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, কে তাহাকে পূর্ণ পরিণতির পথে লইয়া যাইবে? কারণ, তাঁহাদের পরে যাঁহারা বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কৃতকার্য্য লেখকের সংখ্যা, আবার তদপেক্ষা আরও অল্প।

১৩০৭ সালে সাহিত্য-সভা থেকে প্রকাশিত হয় নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিকপত্র 'সাহিত্য-সংহিতা'।

সাহিত্য-সংহিতা।

১ম খণ্ড] বৈশাখ ১৩০৭। [১ম সংখ্যা

অবতরণিকা।

সাহিত্য-সংহিতার প্রথম প্রচার হইল, ইহাদ্বারা কি কার্য্য সাধিত হইবে বলিতে পারি না, এখন সে প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সময়ও উপস্থিত হয় নাই। সাহিত্যসেবী-পণ্ডিতমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায়, এই নূতন পত্রিকা উপলক্ষ করিয়া যদি কখন বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে কোন প্রকার সুফল ফলে—তখন আশা করিবার, আকাঙ্ক্ষা করিবার যথেষ্ট ভিত্তি দেখিতে পাইব, বলিবার কথা পাইব, দেখাইবার, জানাইবার ও শুনাইবার বিষয় পাইব। এখন নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার শক্তি নাই, আশার অঙ্কুর মাত্র উদ্গত হইয়াছে, নবীন উৎসাহের সূত্রপাতমাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে, বিদ্বজ্জনের অনুরাগ ও অনুকম্পা লাভে কিরূপ সমর্থ হইব তাহারও সম্পূর্ণ আভাস প্রাপ্ত হই নাই, ফলের কথা অপ্রাসঙ্গিক সুতরাং এ অবস্থায় এই সাহিত্য-সংহিতার প্রচারকালে পূর্ব্বভাষের বাহুল্যই বিড়ম্বনা।

সংহিতা শব্দের সহিত যেন একটু মহত্ত্বের, একটু গম্ভীরতার ও একটু মধুরতার সংস্রব আছে। মন্বাদি প্রণীত শাস্ত্রসমূহের সংস্পর্শে এই শব্দে আমাদিগের হৃদয়ে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এক্ষণে আমাদিগের দুর্ব্বল হস্তে পড়িয়ে সেই পবিত্র শব্দের অপব্যবহার হয়, এ আশঙ্কার উদ্রেক সকলেরই হইতে পারে। তবে, ভরসার মধ্যে এই যে, আমাদিগের শক্তি যতই অল্প হউক, বিদ্যা বুদ্ধি যতই সামান্য হউক, মনের আকাঙ্ক্ষা কোন ক্রমেই লঘু নহে—সেই আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা ও পবিত্রতাই আমাদিগের সাহস ও সামর্থ্যের মূল। সাহিত্যই সম্যক্‌রূপে আমাদিগের আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য সুতরাং আমাদিগের পত্রিকার নাম সাহিত্য-সংহিতা রাখা হইল। জাতকর্ম্ম ও নামকরণ সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা বলিয়াই আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি।

১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয় এলাহাবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিকপত্র 'প্রবাসী'। "বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম।"

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। | বৈশাখ, ১৩০৮। | ১ম সংখ্যা

সূচনা

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা "প্রবাসী" প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল। এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।

আবাহন

১

এ বিদেশে, এ প্রবাসে, আমি গো প্রবাসী;
প্রাণ কাঁদে, হতাশে, নিরাশে! হে ভারতি,
এস, এস আজি। কল্পনা-কুসুম, সতি,
কৌতুকে সুহস্তে লয়ে; গালভরা হাসি
মুখে; নয়ন-কিরণে সৌভাগ্য প্রকাশি;
মোহন শ্রবণযুগে রক্তোৎপল দুল,
ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ বাসন্তী দুকূল;
এস, বিশ্ববিমোহিনি, লয়ে রূপরাশি।
এস মা, এস মা আজি, উষা যথা আসে,
আলোক-আবীর-রাশি ঢালি, হাসি, হাসি,
অরুণের শিরে!—আসি যথা পৌর্ণমাসী
খুলি দেয় জ্যোৎস্না-ফোয়ারা!—বিশ্ব ভাসে
আনন্দ-সলিলে! লয়ে অপূর্ব্ব অমিয়া,
দেখা দে মা, দেখা দে মা, জুড়াইয়া হিয়া!

২

এস মা, কবির নেত্রে সহসা উদয়
অনুরক্ত ফুলবীথি হয় গো যেমতি,
কানন-দুর্গমে! ভক্ত-সাধক-হৃদয়
করি উচ্ছ্বসিত, ইষ্টদেবতা-মূরতি
হয় যথা আবির্ভূত! বঙ্কারে যেমতি
করি পুলকিত, করি শঙ্খধ্বনিময়
গৃহাঙ্গণ, আঁধারেতে জ্বালি শত জ্যোতি,
জননী-উৎসঙ্গে শোভে সুন্দর তনয়!
শিশু যবে, গৃহ ছাড়ি, পথ হারাইয়া,
হয়, আহা! ভয়-ত্রস্ত, ক্রন্দন-আকুল,
মা তাহার, শশব্যস্তে, এলাইয়া চুল,
উন্মাদিনী-প্রায়, লয় বাছারে তুলিয়া!
আমি কাঁদি এ প্রবাসে; কোথা মা গো তুমি
লও মোরে ক্রোড়ে তুলি, নেত্রজল চুমি!

৩

বহুদিন পাই নাই শেফালীর বাস;
বহুদিন শুনি নাই কোকিল-কাকলী!

শুধু বড়োদের পত্রিকাই নয় ছোটোদের জন্যও পত্রিকার শুরুও হয় পয়লা বৈশাখেই। যেমন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ (পয়লা বৈশাখ ১৩২০)।

প্রথম বর্ষ। বৈশাখ ১৩২০। প্রথম সংখ্যা।

নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে,
‘সন্দেশ’ এসেছে আজ নব সাজ প’রে।
ডাকিয়া লইব তারে আদরে সবাই,
হাসি মুখে ত্বরা করে আয় তোরা ভাই।
সরল হৃদয় তার, মধুর বচন,
শুনিব তাহার মুখে সন্দেশ নূতন।
বিভুর আশীষ বাণী তাহার মাথায়,
চাহিয়া লইব সবে, আয় তবে আয়।
এ নব সন্দেশ যেন বরষ বরষ,
জাগায় নবীন আশা, নূতন হরষ।
শুনায় নূতন বাণী, আনে নব কাজ,
কল্যাণে পুলকে ভরা,—এই চাহি আজ।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বি, এ।

‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পর ১৩২৯ সালে ‘বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির’ থেকে প্রকাশিত হয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত ‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকা।

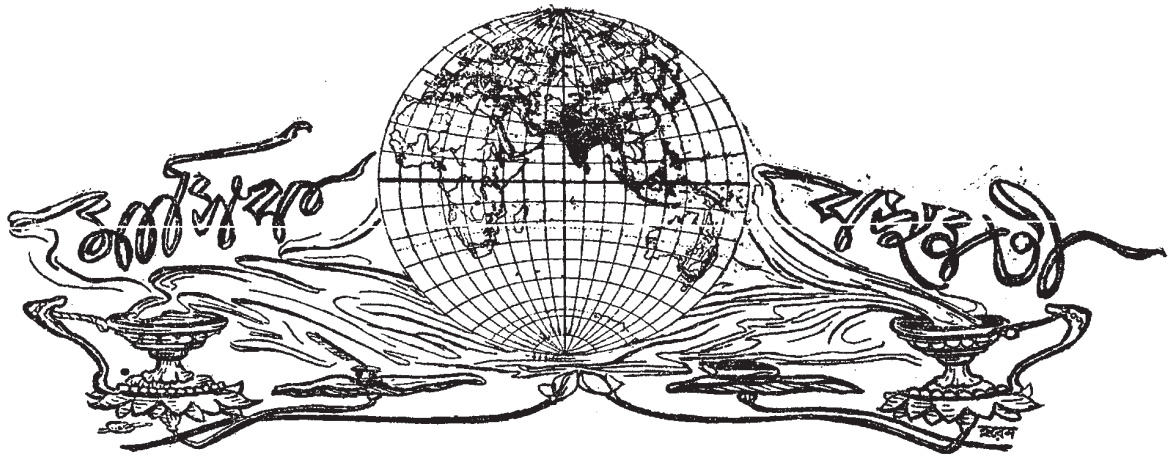

১ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২৯ | ১ম সংখ্যা

পত্র-সূচনা।

আজ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ যখন ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয়, তখন তাহার পত্র-সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় মাসিকপত্র প্রচারের কারণনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—“যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।” আজ আর সেরূপ কারণ-নির্দ্দেশের কোন প্রয়োজন নাই। কেন না, তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের সাধনাফলে বাঙ্গালায় আজ পাঠকের অভাব নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় যে সব উক্তি বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, সে সকল সাদরে অনূদিত হইয়া বিদেশীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুবাদে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। অর্দ্ধ-শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বিশেষ সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইয়াছে।

‘বঙ্গদর্শন’ তাহার সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিল। ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের দ্বাদশ বৎসর পরে ‘প্রচারের’ “সূচনায়” লিখিত হইয়াছিল—“চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল।” তখন ‘আর্য্যদর্শন’, ‘বান্ধব’ প্রভৃতিরও সেই দশা হইয়াছিল; কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নাই। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথের ‘সাধনা’ চারি বৎসর যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল—কিন্তু সে জন্য বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে দায়ী করা যায় কি না, সন্দেহ। আজ ‘ভারতী’, ‘প্রবাসী’, ‘মানসী’ ও ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতি পত্র নিয়মিতভাবে প্রচারিত ও পঠিত হইতেছে। সমাজ-পতির ‘সাহিত্য’ ও দেবীপ্রসন্নের ‘নব্য ভারত’ আকারে ছোট হইলেও বঙ্গীয় পাঠকসমাজে আদর-লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

বাঙ্গালার পাঠকসমাজের পরিসরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও মাসিকপত্র-প্রচার সম্ভব হইয়াছে। ভাবের প্রচার যত অধিক হয়, উন্নতির পথ ততই জাতির পক্ষে সুগম হয়। সেই জন্য আমরা যথাসাধ্য সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করিবার জন্য এই পত্রিকার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মা’র আশীর্ব্বাদ ও বঙ্গীয় পাঠকদিগের প্রীতি লাভ করিতে পারিলে আমরা শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কোন কোন সাময়িক পত্রে রাজনীতিক কথার আলোচনা বর্জ্জিত হয়। আমরা তাহা করিব না। আজকাল রাজ-নীতিক সমস্যাই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি রাজনীতিক উন্নতিসাপেক্ষ। সেই জন্য আমরা রাজ-নীতিক বিষয়ের আলোচনা করিব। বিজ্ঞানের কথা—শিল্প-বাণিজ্যের কথা—ঐতিহাসিক কথা—কৃষি প্রভৃতির উন্নতির

পরবর্তীকালে পয়লা বৈশাখ আত্মপ্রকাশ করেছে বহু বাংলা সাময়িকপত্র। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘ছোটদের বার্ষিকী’ ‘হালখাতা’।

হালখাতা

(ছোটদের বার্ষিকী)

প্রথম বর্ষ, ১৩৪৮

বিশ্ব-কবির আশীর্ব্বাণী

আমি অতি পুরাতন, এ খাতা হালের
হিসাব রাখিতে চাহে নূতন কালের।
তবুও ভরসা পাই আছে কোনো গুণ—
ভিতরে নবীন থাকে অমর ফাগুন।
পুরাতন চাঁপা গাছে নূতনের আশা
নবীন কুসুমে আনে অমৃতের ভাষা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু সাময়িক পত্রিকাতেই নয়, সংবাদপত্রেও বাংলা নতুন বছর শুরু উপলক্ষ্যে থাকত নানান ধরনের লেখা, নববর্ষের পাতা—এমনকি বিশেষ ক্রোড়পত্র বিতরণ করার অনেক উদাহরণও আছে।

শুভ পয়লা বৈশাখ বা বাঙ্গালীর নববর্ষ

কাঙ্খিথ ফুৎকৃত ও কীর্তিত

আর যাহাই হউক না কেন, এই সনাতন পুস্তকটি না হইলে আমাদের বাঙ্গালীর আদৌ চলে না। বার্তাকু কুষ্মাণ্ড স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংস হইতে শুরু করিয়া অশ্লেষা মঘা আদি সকলকে প্রতি পদে এড়াইয়া আমরা যে এখনও সগৌরবে বাঁচিয়া থাকি—এই বিশেষ জিনিষটিই তাহার প্রমাণ। আর সব ভুলিতে পারি, কিন্তু বাঙ্গালীর পঞ্জিকা ভুলিলে চলিবে না।

তাহা হউক। কিন্তু খাতা মহরৎ! এ ব্যাপারটি কিন্তু আমাদের এহ তারিখে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া থাকে; মিষ্টি মুখের জন্য এবং থাক। পয়লা বৈশাখে মন খারাপ করিতে নাই পয়লা বৈশাখ তারিখে বহুবৈর কুটুংকম। অর্থাৎ 'পয়লা বৈশাখ আমরা আপনাদের স্মরণ করিতেছি, আশা করি আপনারাও

আর বঙ্গীয় মহাজনী আইনের প্রশ্রয় থাকা উচিত নয়। সংসারে যদি মানুষের বিল বাকীই না পড়িল তবে আর পৃথিবীতে বাস করিয়াই বা লাভ কি? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি কী ভয়ঙ্কর সে অবস্থা! শুভ পয়লা বৈশাখ নাই; খাতা মহরৎ নাই; চক্চকে ঝক্‌ঝকে নাই; রাস্তায় লাউড স্পীকারের চীৎকার নাই; ছেলেপিলেদের লইয়া দোকানে দোকানে ভুরিভোজ নাই; দোকানীদের মুখে সেই 'হেঁ হেঁ' নাই! উঃ!

থাক! আর ঐ দুঃস্বপ্ন রচনা না করিয়া আসল আনন্দেই প্রবেশ করি এবং এই আনন্দের জন্যই তো আজকাল সভ্য সমাজে Hire Purchase System-এর উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে এ জিনিষটার নাম ছিল Easy Payment System অর্থাৎ কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য দিয়া পূর্ণ মূল্য শোধ করা ও জিনিষটা ক্রয় করা। কিন্তু ভাষাটির মধ্যে একটু যেন কেমন অসম্মানের ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ কিনা: "কি! এ জিনিষটা কেনবার টাকা কি আমার নেই? এত বড় কথা! একসঙ্গে দাম দেবার আমার ইচ্ছে নেই, তাই! নইলে…" ইত্যাদি বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা এই জন্যই 'Hire Purchase শব্দটির সৃষ্টি করিয়া-

পৃথিবী একাকার হইয়া যাইত। তাহা হইলে এখনকার দুবেলা শ্যামবাজার কালীঘাট Monthlyর সুবিধায় দোলতে বেড়াইবার জন্য গ্রীনল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, South Sea এ সব 'এপাড়া ওপাড়া' হইয়া যাইত। (আমার কিন্তু এখনও আশা আছে, ব্যবসায়ীদের যেরকম পরিষ্কার মাথা তাহারাও বাকীতে বেড়ানো জিনিষটার একটা কোন নূতন ভঙ্গি কিছু কালের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে। আমরা সকলেও সে সময়টার আশায়ই রহিয়াছি।)

মানুষের মনে আশা' জিনিষটাই সবচেয়ে বড় কথা। এই যে ব্যবসায়ীরা 'হালখাতার নিমন্ত্রণ করে সে সর্ব্বদাই আশা করে যে খাতামহরৎ উপলক্ষে তাহার বাকী বাধ হইবে, তাহার বহু

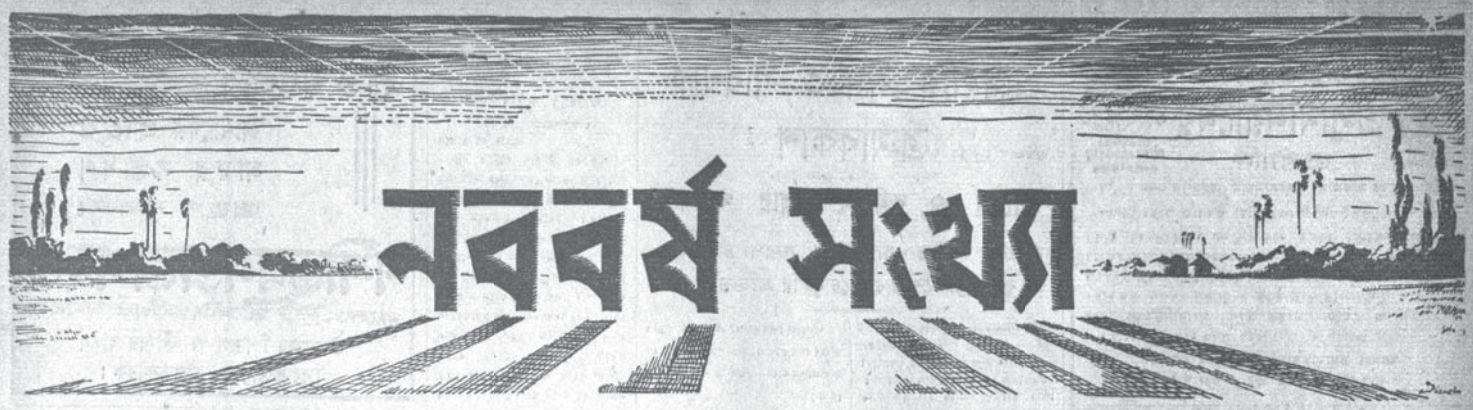

নববর্ষ সংখ্যা

রবিবার ১লা বৈশাখ, ১৩৪৭ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪০

নববর্ষ উৎসব ঃ অখণ্ড কালের ইতিহাসে এক পৃষ্ঠা

খোলা চিঠি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

"সুধাকর" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনি আমাকে নববর্ষের জন্য দু-কথা লিখতে অনুরোধ করেছেন। এজাতীয় অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সদাই প্রস্তুত। কিন্তু সব সময়ে এ অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনে। তার কারণ এখন আমার spirit is willing হলেও flesh is weak.

এখন আমার দেহ জীর্ণ, তার উপর গ্রীষ্ম এবার লাফিয়ে এসেছে। আমি চিরকালই গ্রীষ্ম-কাতর। আমি গরম দেশে জন্ম গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু গ্রীষ্ম এখনও আমার গা সওয়া হয়ে যায়নি। বরং বয়সের সঙ্গে গ্রীষ্ম কাতরতা বেড়েই চলেছে। ফলে হাত আর এখন ফুর্তি করে কলম চালাতে পারে না। আমার হস্তাক্ষর এখন আর মনের কথার মাছি মারা নকল করতে পারে না। তাই হয় লিখ লিখতে কলি লিখে বসব। এ রকম অক্ষর বিপর্যয় অবশ্য প্রীতিকর নয়। অবশ্য কেউ কেউ আছেন যাঁরা অভ্যাস করে লিখে যেতে পারেন, যে লেখার সঙ্গে মনের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু মনের সঙ্গে অঙ্গুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করার কৌশল আমি কস্মিনকালেও আয়ত্ত করিনি। আমি পূর্বে বলেছি যে, গরমে আমার দেহমন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

গরমের দেশে জন্মালেও অনেকের পক্ষে গরমটা তেমনি দুঃসহ দরিদ্রের ঘরে জন্মালেও দারিদ্র্য যেমন দুঃসহ। নববর্ষের আগমনে আমার মনে কোনও নতুন আনন্দ আনে না। কারণ বহুদিন থেকে এদেশে কোনও বিশেষ দিন নববর্ষের প্রথম দিন নয়। পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার হিসেব থেকে নয়; মনের হিসেব থেকে। পয়লা বৈশাখ প্রতি বৎসর আসে আর যায়, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরপাক খেতে বাধ্য প্রকৃতির নিয়মে। গ্রহ নক্ষত্রের কোন রকম ইচ্ছা নেই, বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই। মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে বলে তার যত মুস্কিল ঘটেছে। আমরা চাই একরকম, পাই অন্যরকম।

ভারতবর্ষের সেই দিন নববর্ষ আসবে, যেদিন ভারতবাসীরা নবজীবন লাভ করবে। সে দিন কোন দিন? যে দিন আমরা স্বাধীন হব। সে কোন দিন? আমি জানিনে। স্বাধীন কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। কেন না এখন ও কথাটা বাজারে হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের শাসনকর্তারা বলছেন যে আমরা স্বাধীনতা লাভের অধিকারী নই; কারণ আমাদের মধ্যে ঐক্য নেই। আমাদের মধ্যে এক বিষয়ে ঐক্য আছে,—আমরা সকলেই সমান পরাধীন। অধীনতাই আমাদের অনেক অনৈক্যের মূল। তা ত আবরণ হলে অনেক ক্ষুদ্র মনোভাব থেকে মুক্ত হব। আমরা যে, যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি তা নয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনে কতকটা আলো এসেছে। আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব, স্ত্রী শিক্ষার অভাব কতকটা মোচন করেছি। জাতিভেদ প্রথা পুতুল পুজোর অভ্যাস,—কতকটা বর্জন করেছি;—কিন্তু তবুও স্বাধীন হই নি। আর যাঁরা আমাদের স্বর্গ স্থানে নিয়ে যাবেন বলে বদ্ধপরিকর হয়েছেন তাঁদের অনেক মত আমাদের মনে স্থান পায়নি। মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও খদ্দরের সাহায্যে যে আমরা স্বাধীন হব—একথা কখনও মনে পারিনি—আজও পারিনে এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের কথা আরও বুঝিনে। কংগ্রেসের তাজা দলই যে কংগ্রেস এমনও মনে হয় না। ব্যাপার যা ঘটেছে, তাতে কংগ্রেসের majority ও minority'র বিভাগ। এক হচ্ছে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক কলহের বড় কথা।

কংগ্রেসের দু'দলের যুদ্ধের একটা কথা নিত্য শোনা যাচ্ছে, সে কথা হচ্ছে সংগ্রাম। এ সংগ্রামের অর্থ বোধহয় অহিংস নয় হিংস্র; আর তা হবে অন্ততঃ বাঙলার majority র সঙ্গে minoraty'র হচ্ছে সংবাদপত্রের গুতো। এ যুদ্ধে আমার আপত্তি নেই—শুধু আশা করি দুদলেই এ ক্ষেত্রে সাধুযুদ্ধ করবেন। "মাব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ং"—এ উপদেশ আমি অবশ্য দিতে পারিনে। মনুর এ বচন মেনে চললে সংবাদপত্র চালানো যায় না। সাধুযুদ্ধের একমাত্র মারাত্মক অস্ত্র হচ্ছে সত্যকথা; তা সে কথা প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক।

নববর্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষ তাহার তপ্তাতাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জলজটামণ্ডিত বৈরাগ্য মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে—তাহা বহু কর্মের ক্রীতদাস নহে।

* * *

আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না—জানিতে পারিতেছি না। ইংরাজী-স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র বিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব ঐ অচলশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে—যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন—তাহাকে অবিশ্বাস করিব না,—যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

আজি নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

* * *

এখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসববস্ত্র পরিয়াছেন এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষি-কবিরা ত্রিষ্টুভ ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীতহরিৎ বসনখানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন, উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই সমীর-কম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্য্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণজীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহুসহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধার-করা ফুলপাতায় সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচির-প্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নববল, নবসৌন্দর্য্য আমরা অন্যত্র হইতে ধার করিয়া লইয়া সাজিতে যাই, দুই দণ্ডপরেই তাহা কদর্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহসিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্পপত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধনরজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে। বিদেশের বেশভূষা ভাবভঙ্গী আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন, শ্রীহীন হইয়া পড়ে—বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জীব ও নিষ্ফল হয়। কারণ, তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই—তাহা অসংলগ্ন অসঙ্গত তাহার শিকড় ছিন্ন। আজ নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চির পুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না—তখন সেই অম্লান গৌরব মাল্যখানি আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয় চিত্তে নববলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব! জয় হইবে ভারতবর্ষের জয় হইবে! —(সমূহ)

নতুন বছর

প্রবোধকুমার সান্যাল

ইংরেজী নতুন বছরের প্রথম দিনটি যখন আসে সম্পূর্ণতার সঙ্গে তখন ঘরে ঘরে ঐশ্বর্য্যের সমারোহ, শীতের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে মানুষ তখন সজীব, ফলে ফুলে শস্যে চারিদিক পরিপূর্ণ; অভাব, রোগ, কৃপণতা, অবসাদ কোথাও কিছু নেই। ইংরেজি নতুন বছরের সঙ্গে আসে আয়ু শ্রী, শক্তি ও কর্মোৎসাহ। আহারে, বিহারে, নিদ্রায় সম্ভোগে তখন কারো ক্লান্তি অথবা বিরক্তি নেই। জীবন চাঞ্চল্যে আর প্রাণের প্রাচুর্য্যে ইংরেজি নতুন বছরের দিনটি ঝলমল করে।

কিন্তু ভারতীয় নতুন বছরের যে পয়লা বৈশাখ তার অন্য রূপ। আমাদের নববর্ষের দিনটি আসে যখন অবসন্ন বসন্তকাল তার শেষ বিদায়ের উষ্ণ নিশ্বাসটি ফেলতে থাকে। আকাশের নীলিমা পুড়ে গেছে, বায়ুর আর স্নিগ্ধতা নেই, ফুলদলের সমারোহ শেষ হয়ে গেছে, নদীতে জলধারা শীর্ণ তড়াগ-পুষ্করিণী শুষ্কপ্রায়, ক্ষেতে শস্য নেই, গাছের কাঁচা ফলে তখনও মাধুর্য্য আসেনি। যতদূর চেয়ে দেখি প্রান্তর ও জনপদ রিক্ত রূপণ ধূসর। বৈশাখের আকাশ উপরে কালোপাত্রের ন্যায় দগ দগ করে জ্বলে, তার নীচে রুক্ষকেশা ভৈরবীর মত প্রকৃতি জলচঞ্চলহীন প্রান্তরে মূর্চ্ছিত চক্ষে ধ্যানাসীন। আমাদের নতুন বছরের কোনো শ্রী নেই, উৎসাহ নেই, বরং অস্বাস্থ্যে, দারিদ্র্যে, মহামারীতে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে ভীষণাকার।

এর কারণ অস্পষ্ট নয়। নতুন বছর বলতে আমরা জীবনের একটি নবীনতা ও নবচেতনা বুঝি। নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে আমরা ফিরে যাই সৃষ্টির আদিম অবস্থায়। হয়ত তখন সদ্যসৃষ্ট প্রান্তর এমনি রিক্ত ও নিঃস্ব ছিল, তখনও ফুল, ফল, শস্য, সাজ এসে পৌঁছয়নি। আমরা সেই অভাব আর শূন্যতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নব-জীবনের জন্য প্রার্থনা জানাই। এই প্রার্থনার পরে ফলে এসে পৌঁছয় মাধুর্য্য, আকাশ থেকে বর্ষণ এসে মৃত্তিকাকে সরস করে প্রাচীন গাছের বীজ অঙ্কুরে রূপান্তরিত হয়,—একদিন লক্ষ্মী ঘরে ওঠেন। জীবনের চেহারাও এমনি। মানুষ জন্মগ্রহণ করে রিক্তহস্তে, সকলশূন্য অবস্থায়। ধীরে ধীরে তাকে কেন্দ্র করে একটি জগৎ সৃষ্টি হয়। আমাদের নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে এত নবীনতা আছে বলেই তার এত অভাব, এত রিক্ততা; তাকে বৃহৎ পরিমাণ সৃষ্টি করতে হবে বলেই সে এমন শূন্যগর্ভ।

আমরা সাধারণ মানুষ সকল দৃষ্টিতে দেখি, প্রাণান্তকর উত্তাপ আর অবসাদের মধ্যে নতুন বছর আরম্ভ হোলো। এক একটি বছর আমাদের ক্ষয় আর ক্ষতির ইতিহাস। পৃথিবী চলেছে সেই পুরনো চালে, মানুষের ভিতরে সেই হিংসা ও ক্রূরতা; শয়তান তেমনি রাজবেশ পরে দাঁড়িয়ে। যুদ্ধ বেধেছে, জাহাজ ডুবছে, মানুষ মরছে, রাজ্য লোপাট হচ্ছে—কিন্তু মহাযুদ্ধের অপেক্ষাও বড় যুদ্ধ আছে—সে যুদ্ধ আমাদেরই জীবনে। ছোট আঘাত, ছোট অপমান, ছোট ছোট দ্বন্দ্ব ও মহিমার আত্মবলি,—কিন্তু তার ইতিহাস অনেক বড়, তার সংগ্রামের রক্তপাত পরিমাণে অনেক বেশী এবং তাকে ঘিরে যে মহাকাব্য তৈরী হয়, মানবতার আদি অন্ত ইতিহাসের পাতায় অত্যাচার উৎপীড়ন ও রক্তক্ষরণের কাহিনী বোধ করি কোনোদিনই লেখা হয় নি।

সেই কারণে প্রতি নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে আমাদের উৎসুক ওষ্ঠ একটি নব জীবনের প্রার্থনা নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। আমাদের সেই চিরপ্রার্থিত প্রথম দিনটি মহাকালের খাতায় আজও লেখা হয় নি।

পয়লা বৈশাখ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রতি বছরে দেয়াল পাঁজির এক একটি পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে এক দিন শেষ পাতে এসে পৌঁছুই। সেটা যেদিন ফেলে দিতে হয়, সেদিন বুঝতে পারি বছর শেষ হল—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে, টের পাই বয়স এগিয়ে চলেছে। বছরের পর বছর যাচ্ছে, ছোট-বড় ভালো-মন্দ নানা জটিলতার ভেতর দিয়ে চলেছে জীবন, সমাধান নেই, সমাপ্তি নেই, তবু প্রতীক্ষারও বিরাম নেই! অবাক হয়ে ভাবি, অখণ্ড অপরিমেয় কালকে নিজের সুবিধা মতো ছকে ফেলে হিসাব করার এই ছেলেমানুষী কি জন্যে? আমার আগে আমার কোন সময় ছিল না, আমার পরেও তা থাকবে না—যা থাকবে সে হল অখণ্ড অফুরন্ত অনির্বচনীয় কাল। তবে কেন এই সংক্ষিপ্ত কটা দিনকে এমনভাবে কৃত্রিম যোগ-বিয়োগ দিয়ে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখতে চাই? চোখ বুজে মনে মনে মহাকালের অন্তহীন প্রবাহের একটা আলেখ্য তৈরি করি—ধূসর পশ্চাৎপটের উপর দেখি জ্বলছে একটি ক্ষীণ আলোর কণিকা সে আমার জীবন! হাঁপিয়ে উঠি। মনে হয় মিথ্যে, সবই মিথ্যে!

কিন্তু আমার মতো বেহিসেবী লোকে পৃথিবী বোঝাই নয়, এইটুকুই যা সান্ত্বনা। বছর ভোর গয়লা, মুদী, ডাক্তার, আর যাঁদের খাতায় বাকী বকেয়ার জের টেনে চলছি—কখনো দশ আনা, কখনো ছ আনা দিয়ে, ষোল আনাটাকে ভাবী দিনের জন্যে মুলতুবী রেখে যাচ্ছি, তাঁরা এবার হাল খাতাবের সময় পাওনা বুঝে নেবার দাবী নিয়ে হাজির হবেন। বলা অনাবশ্যক যে সেটা দিতেই হবে, তা না হলে শুধু লেনদেনই বন্ধ হবে না পারিবারিক প্রশান্তিও রীতিমতো বিড়ম্বিত হতে পারে। তাই পুরানো দেনার ওয়াশীল করতে ছুটি নূতন দেনার সন্ধানে! বুঝি নববর্ষের অর্থটা বেশ পরিষ্কার।

বাড়ীতে খরচের হাতটা যাতে কম হয় তার জন্যে খোলাখুলির একটু ইঙ্গিত দিই। তার উত্তরও আসে খোলাখুলিভাবে আমার—আমার বেপরোয়া চা ও চুরুটের খরচ, বই কেনার খরচ ট্রামবাসের খরচ, বা এটিয়ারা অন্যান্য অপব্যয়গুলোর বেলা একটু ভাবতেন চলতে আগে চেষ্টা করলেই কি ভালো করি না? স্বীকার করতে হয়, ঠিকই ত এবং ও প্রসঙ্গ চাপা না দিয়ে আর উপায় কি? যারা আমার চেয়েও কম উপার্জন করে, অথচ সহরে সৌখীনতার স্রোতের মুখে পাখীর মতো পোঁ পোঁ করে বয়ে যায় তাদের অসাধারণ পুরুষ বলে মনে করি, আর অন্তরে অন্তরে সাধুবাদ দেই এই বলে যে, তারা নিশ্চয় কোন কৌশল জানে, যাতে তাকে আর বছরে এমন তাল রেখে চলতে পারে।

বর্তমান জিনিষটা আমার কাছে মানসিক এবং ব্যবহারিক দুদিক থেকেই অশান্তিপ্রদ—একটানা দিন যাচ্ছে নানা আঘাত উপঘাতের ধাক্কা খেতে খেতে ভেসে চলেছি, সে আমার এক রকম লাগে। হঠাৎ টনক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হয় যেই, তখনই দেখি বয়সের পুঁজি কমছে, জীবনের খাতায় জমার ঘর হুহু করে আসছে খালি হয়ে, আর খরচের ঘর হাওলাতী অঙ্ক হয়ে উঠছে পর্বত প্রমাণ! এই উদ্বৃত্তটা শেষপর্যন্ত মেটাবো কি দিয়ে, ভাবতে ভাবতে অধীর হয়ে পড়ি। তাই আমি শুধু বয়ে যেতেই চাই, থামতে বা পিছু ফিরে দেখতে চাইনা—কি ছিল, আর কি গেল!

মানুষের বিপদ এই যে তার মন আছে, এবং সেই মনটা শান্তি খোঁজে, কিসে শান্তি তা না বুঝেও! দুর্ভাগ্যের বিষয়, অশান্তিপ্রবণতার অদ্ভুত তাড়নাই নাকি তার ইতিহাস! হতে পারে তা, কিন্তু সে বড় দুঃখের, আমি সে ইতিহাস চাইনে। তাই আমার কাছে সময়ের গতিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিচ্ছেদ রচনা করে, মাঝখানে একটা বর্ষ-বিভাগ খাড়া করে তোলা এবং তার বেদনাটাকে চাপা দেবার জন্যে বাইরে আড়ম্বরের আতিশয্য করা, অন্যায় বলে মনে হয়। পরিমাণহীন সময়কে বয়ে যেতে দাও, ভেসে চলো তার সঙ্গে মাথা তুলে তার দিকে দেখতে চেও না।

কিন্তু উপায় কি? ঘরের দেয়াল পাঁজি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই অনেক

(শেষাংশ ৯ম কলমে)

আজি হ'তে শতবর্ষ পরে—'

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

—বৈশাখ ১৪৪৭!

১৩৪৭-এর পারে দাঁড়িয়ে সুদূর-প্রসারী কল্পনা—"বঙ্গাব্দ ১৪৪৭ এর মানব-প্রকৃতির রূপ কল্পনা করি। সেদিনের মানুষের সঙ্গে কি এদিনের মানব-প্রকৃতির কোনো সাদৃশ্য থাকবে? জীবন কি আরো রোমাঞ্চকর আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে? কিন্তু বেশী দূর যাবার আগে দু'পা পিছিয়ে যে অতীতে অবগাহন করে এলাম, তার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অতীত ও বর্তমানের মানব প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করলে অনাগত কালের মানব প্রকৃতি কি ভাবে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব, তার একটা মোটামুটি ধারণা হতে পারে।

আজিকার কর্মব্যস্ত নাগরিক জীবনের কলরবের মধ্যে বহুন বহন স্বর্গত পূজ্য পুরুষকে কোলাহলমুখর সহরের রাজপথে দ্রুতগামী মোটর, বাস, ট্রাম, আকাশে এরোপ্লেন, ঘরে ঘরে টেলিফোন, রেডিও, সারা পৃথিবীর সংবাদ প্রতি মুহূর্তের প্রাপ্য। যুরোপে মুক্তিধারী দুর্দ্ধর্ষ সন্তানেরা সজ্জিত, মেয়েরা অবলীলাক্রমে চলেছে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে পুরুষের গা ঘেঁসে আদালতের আঙিনায় শামলা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়ের দল, তাঁদের মধ্যে কেউ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কেউ সভাপতি কেউ সহকারী মন্ত্রী। বিবাহ ব্যাপারে নরনারী উভয়ের সমান স্বাধীনতা। সামাজিক বা পারিবারিক বিধিগত জাতিসম্মানার প্রথা লোপ পেয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফলে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা প্রথা প্রচলিত হয়েছে। ব্যক্তি এতে আবহমান ব্যক্তি ফুটে উঠেছেন।

অবিমিশ্রভাবে এই তালিকা বাড়ানো চলে, কিন্তু পূর্বপুরুষের বিশেষ ও আত্ম সন্তার করতে এই ই যথেষ্ট।

"তিনটি মূলধারার মধ্যে এ রূপান্তরের বিশিষ্ট ধারার শ্রেণী বিভক্ত করা চলে—যথা: (১) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগত রূপান্তর, (২) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনজনিত রূপান্তর, (৩) স্বাধীনতার প্রসার হেতু নারী-দের মানসিক নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন।

সকল প্রকার জাগতিক পরিবর্তনের এই তিনটি মূলধারা। আজ এবং আগামীকালের পরিবর্তন এই ক্রম-পর্য্যায়েই ঘটে। আজ ও আগামীকালের মানব-প্রকৃতির রূপান্তরের ক্রমপর্য্যায় এই ভাবেই বিচার করা সহজ হবে।

আগামী শতবর্ষের সর্বপ্রধান রূপান্তর আসবে বিজ্ঞানের মারফৎ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর রূপ একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের রহস্যলোক আগামী শতাব্দীতে কিভাবে উদ্‌ঘাটিত হবে তা আমাদের কল্পনাতীত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে পরিবর্তন ঘটেছে, আগামী শতাব্দীর পরিবর্তন আরো ব্যাপক আরো বিচিত্র।

যান-বাহনের ব্যবস্থা হয়ত এতো উন্নত হবে যে, সৌখীন সমাজ গ্রীষ্ম কালের উত্তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য দার্জিলিং না গিয়ে সুইজারল্যাণ্ড ছুটবেন। Cunard Line এর আটলান্টিক টিকিট কেটে লণ্ডন বেড়িয়ে আসা চলবে। কলিকাতার মানচিত্র যেমন আমাদের মনে বিস্ময় আনে না, তেমনই উত্তরকালের মানুষের মনে সারা পৃথিবীর মানচিত্র কোনো চাঞ্চল্য আনবে না। ৩৫ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।' তখনকার কালে "দেশে দেশে মোর ঘর আছে" এই কথাটুকুই প্রত্যয়যোগ্য হবে, একই কালে একই

(শেষাংশ ১৫ পৃষ্ঠায়)

(৩য় কলমের শেষাংশ)

কিছুই অভ্যাসবশে চলাতে হয়। নূতন করে বাঁচিবার [illegible] বোধ—সম্ভব হলে এত দাম না হইলে ঘুম ভাঙিয়া যেন [illegible] ধরণী ধরে আবার [illegible] কি? জানি 'বেতার ও [illegible] সম্ভব ঘটতে পারে'—তাহলে ও আজ তাহার সঙ্গে মানিয়ে যাবে? [illegible] মন শক্ত করে ভাবি [illegible] একটা দিকে দিয়েছে, তাও আমাকে' গ্রহ-নক্ষত্র মিলিয়ে গণনা করে দেখ দিন— সুতরাং সংক্ষেপে নাও খাটতে পারে। আশ্চর্য্য এই যে লাভের ব্যাপারটা স্বীকার করতে হয় ক্ষতির ব্যাপারটা মেনে না ভাবলে চলে না! বছরের পর বছর চলেছে একই খেলা বার বার, তবু বিরাম নেই। লাভের পড়েও অর্থই মানতে হয় আর অতীত না সহজ হল বা অনাগত। সেই জন্যেই বর্তমানকে মুক্তির দিক দিয়ে স্বীকার করি আর না করি, বিশ্বাসের প্রকাশ [illegible] না। তবু হয়, এবার কিছু বদলেও বদলে যেতে পারে হয়ত—আশা ত রয়েছে অনেকের।

নববর্ষ
বৃন্দেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৭৮১)

[illegible]

নববরষের প্রাতে
কুমারী গীতা মুখার্জি [৪৭২১]

[illegible]

নব-বরষের বাণী
অশোক সেন [৪১৪]

[illegible]

বর্ষশেষের বাণী
অনিমা ভট্টাচার্য্য (২১৫১)

[illegible]

নববর্ষ
চৌধুরী মসউদা খাতুন [৫৭৯৯]

[illegible]

শিল্পী:—ফাল্গুনী ঘোষ (সভ্য)

নব বরষের পণ
শ্রীসুধীন সেন (৪৭৩২)

[illegible]

নববর্ষের পণ
শ্রীসুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় [৩৫৫৫]

[illegible]

নয়াবছরের বাউল

নববর্ষ
শ্রীভানুভূষণ কুন্ড

[illegible]

বছরের ১ম প্রাতে

নববর্ষ
মাধুরী বড়ুয়া [৩৩৮৮]

[illegible]

বর্ষগীতি
কুমারী গৌরী মুখোপাধ্যায় [৪৭১৩]

[illegible]

শুভ নব-প্রভাতে
শ্রীপ্রতিভা ঘোষ (৪৫১৬)

[illegible]

আহ্বান
শ্রীনেপালচন্দ্র ছ-ড় [৩৮৫৯]

[illegible]

নববর্ষ
বিমান সরকার ৪৭৭৬]

[illegible]

তেপ্পান্নের রক্ত-রবির বাণী
শ্রীমাখনলাল আগরওয়ালা (৩৩৩৪)

[illegible]

যাত্রা শুরু

নব বছরের মেলা চিত্তরঞ্জন সরকার (৩৭২৬)

নতুন বরষে নবীন ব্রত
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় [২৪৯১]

[illegible]

নববর্ষের প্রশ্ন
চিত্তরঞ্জন সুর (৩২৭২)

[illegible]

[illegible]

"নববর্ষ"
শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল (৩৭১৯)

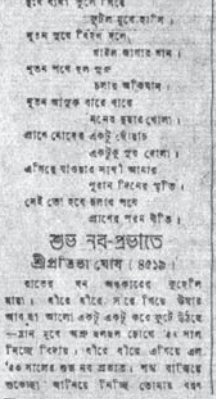

[illegible]

নববর্ষে
শ্রীমধুসূদন বসু (৩৫৬৩)

[illegible]

নতুন দিনের পণ
শ্রীকল্যাণ বসু

[illegible]

পথ ভুলে যারে
কমলা মিত্র (৪৬৪৩)

[illegible]

নতুন দিনের সোনারে কথা
নীহার চট্টোপাধ্যায় [২৪৯০]

[illegible]

নববর্ষের যাত্রা
শ্রীচিত্তরঞ্জন সরকার (৩৭০৪)

[illegible]

নববর্ষে
দীপ্তিরেখা পুরকায়স্থ (সভ্যা)

[illegible]

নব-বর্ষ
শ্রীধনঞ্জয় দাশ [২৩৭০]

[illegible]

'নববর্ষের শুভেচ্ছা'
নীলিমা মিত্র (৪৬৪৪)

[illegible]

"নববর্ষে কিশোরের গান"
শ্রীঅতীনকুমার [৪২১২]

[illegible]

স্বাধীনতা
হেনা কর (৪৪৫৮)

[illegible]

"নববর্ষ"
ভারতী রায় [৪৮৪৮]

[illegible]

শেয়াল পণ্ডিত :— ১লা বৈশাখ মাহাত্ম্য।

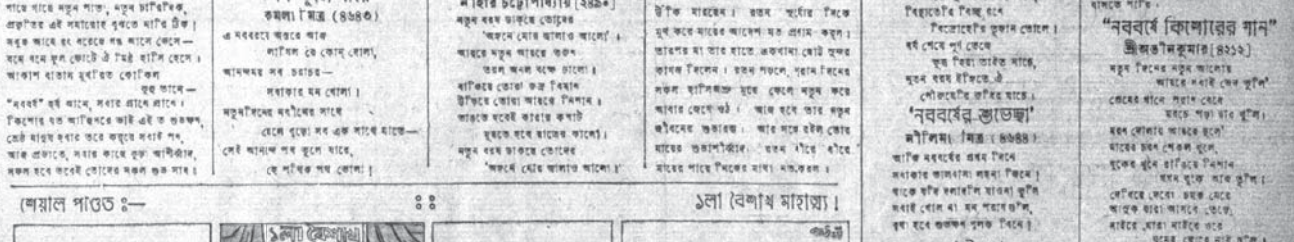

সবাই আমার নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।
—স্বপনবুড়ো

এভাবেই চলেছে বহু কাল। এবছরও সমারোহের সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হত নববর্ষ—হালখাতা। কিন্তু বিধি বাম। করোনার গ্রাসে স্তব্ধ হয়ে গেছে সাধারণ জীবন। বৈদ্যুতিন এবং মুদ্রিত মাধ্যম জুড়ে শুধু হাহাকার। সত্তর বছরের উপর বইপাড়ার সঙ্গে যুক্ত ভানুবাবু (সবিতেন্দ্রনাথ রায়) ২৯ চৈত্র ১৪২৬ (১২ এপ্রিল ২০২০) 'প্রতিদিন' সংবাদপত্রে আক্ষেপের সুরে 'পাঁজির বিক্রি তলানিতে নেমেছে' নিবন্ধে বলেছেন, "আমার দীর্ঘ প্রকাশক জীবনে বইবাজারে এরকম নববর্ষ দেখিনি! আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, তারপরের দাঙ্গা দেখেছি, নকশাল আমল দেখেছি। কোনও পরিস্থিতিই এখনকার সঙ্গে তুলনীয় নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিক্রিবাটা হয়নি ভাল। দাঙ্গার সময় দোকান খোলা যায়নি। নকশাল আমলে চারটের পর দোকান খোলা রাখা যায়নি। কিন্তু একরম ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়নি কখনওই। বাজার পুরোপুরি বন্ধ— এরকম কখনওই হয়নি। এর মাঝে একদিন আমার মেয়ে ইন্দ্রাণী কলেজ স্ট্রিট গিয়েছিল। সেখানে সব শুনশান, কোথাও কেউ নেই। এতে বাজারের পাশাপাশি ক্ষতি তো হল-ই, বাংলা সাহিত্যেরও।"

একই নিবন্ধে তিনি বাঙালির ঐতিহ্যের পঞ্জিকার ব্যবসায়িক মন্দার কথাও তুলে ধরেন, "পাঁজির বিক্রির সময় এইটাই। গুপ্তপ্রেশ, বেণীমাধব শীল কিছু বিক্রি হয়নি।" পরিশেষে তিনি সাধারণ ব্যবসায়ীদের ক্ষতির কথাও বলেছেন, "নববর্ষ উপলক্ষে এই সময় বিশেষ ছাড় দেয় সব প্রকাশকই কম-বেশি। বইমেলা হয় কলেজ স্কোয়ারে। কিন্তু এখন তো কোনও দোকানই খুলছে না, মেলা তো দূরস্থান! ফলে সেই বিশেষ বিক্রিটা হল না। লকডাউন উঠে গেলেও এ ক্ষতি পূরণীয় নয়। যদি মে মাস অবধি

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

পাঁজির বিক্রি তলানিতে নেমেছে

আমার দীর্ঘ প্রকাশক-জীবনে বইবাজারে এরকম নববর্ষ দেখিনি! আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, তারপরের দাঙ্গা দেখেছি, নকশাল আমল দেখেছি। কোনও পরিস্থিতিই এখনকার সঙ্গে তুলনীয় নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিক্রিবাটা হয়নি ভাল। দাঙ্গার সময় দোকান খোলা যায়নি। নকশাল আমলে চারটের পর দোকান খোলা রাখা যায়নি। কিন্তু একরম ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়নি কখনওই। বাজার পুরোপুরি বন্ধ— এরকম কখনওই হয়নি। এর মাঝে একদিন আমার মেয়ে ইন্দ্রাণী কলেজ স্ট্রিট গিয়েছিল। সেখানে সব শুনশান, কোথাও কেউ নেই। এতে বাজারের পাশাপাশি ক্ষতি তো হল-ই, বাংলা সাহিত্যেরও। এবারের বইমেলায় প্রকাশিত বইপত্রর ভাল বিক্রি হচ্ছিল। বাজার না খুললে বোঝা যাবে না সেই বিক্রি বজায় থাকবে কি না! পাঁজির বিক্রির সময় এইটাই। গুপ্তপ্রেশ, বেণীমাধব শীল— কিচ্ছু বিক্রি হয়নি। নববর্ষ উপলক্ষে এই সময় বিশেষ ছাড় দেয় সব প্রকাশকই কম-বেশি। বইমেলা হয় কলেজ স্কোয়ারে। কিন্তু এখন তো কোনও দোকানই খুলছে না, মেলা তো দূরস্থান! ফলে সেই বিশেষ বিক্রিটা হল না। লকডাউন উঠে গেলেও এ ক্ষতি পূরণীয় নয়। যদি মে মাস অবধি লকডাউন চলে, তাহলে দেড়মাস বিক্রি বন্ধ! আমাদের প্রকাশনার প্রায় চার কোটি টাকা টার্নওভার। এই ক্ষতির প্রভাব পড়বে লেখকদের উপর, বাইন্ডারদের উপর, আমাদের অন্যান্য কর্মচারীর উপর— সকলের উপরই পড়বে। লকডাউন করে রোগটাকে আটকানো যাবে, কিন্তু খিদে? রবীন্দ্রনাথের দু'-লাইনের কবিতাটা মনে পড়ে— 'দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।/সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?' এক-একজন মুটে, যাঁরা বইপাড়ায় যাতায়াত করেন, তাঁদের দৈনিক রোজগার ৮০-১০০ টাকা। তাঁদের সংসার কীভাবে চলছে, আমি তো ভাবতেই পারছি না! যাঁরা রিকশা চালান বইপাড়ায়, তাঁদের তো আর কোনও খদ্দের নেই। এ-পাড়ায় ঝালমুড়ি বেচে তাঁদের চলে, তাঁদের দিন কীভাবে কাটবে? এই যে বৈঠকখানা রোড থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে যে বাইন্ডাররা থাকেন, তাঁরা কী দারিদ্রের মধ্যে থাকেন— না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তাঁদের কী অবস্থা এখন কে জানে! আমরা না হয় দু'-তিন বছরের মধ্যে এই ক্ষতি সামলে নিতে পারব, তাঁরা কীভাবে সামলাবেন? তবে এই অসুখের বিরুদ্ধে আমাদের এখন সবাই মিলে লড়াই করতে হবে। সেই লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই নববর্ষটা এভাবেই কাটাতে হবে আমাদের।

লকডাউন চলে, তাহলে দেড়মাস বিক্রি বন্ধ! আমাদের প্রকাশনার প্রায় চার কোটি টাকা টার্নওভার। এই ক্ষতির প্রভাব পড়বে লেখকদের উপর, বাইন্ডারদের উপর, আমাদের অন্যান্য কর্মচারীর উপর— সকলের উপরই পড়বে। লকডাউন করে রোগটাকে আটকানো যাবে, কিন্তু খিদে? রবীন্দ্রনাথের দু'লাইনের কবিতাটা মনে পড়ে— 'দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।/সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?' এক-একজন মুটে, যাঁরা বইপাড়ায় যাতায়াত করেন, তাঁদের দৈনিক রোজগার ৮০-১০০ টাকা। তাঁদের সংসার কীভাবে চলছে, আমি তো ভাবতেই পারছি না। যাঁরা রিকশা চালান বইপাড়ায়, তাঁদের তো আর কোনও খদ্দের নেই। এ-পাড়ায় ঝালমুড়ি

বেচে যাঁদের চলে, তাঁদের দিন কীভাবে কাটবে? এই যে বৈঠকখানা রোড থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে যে বাইন্ডাররা থাকেন, তাঁরা কী দারিদ্রের মধ্যে থাকেন না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তাঁদের কী অবস্থা এখন কে জানে! আমরা না হয় দু'-তিন বছরের মধ্যে এই ক্ষতি সামলে নিতে পারব, তাঁরা কীভাবে সামলাবেন? তবে এই অসুখের বিরুদ্ধে আমাদের এখন সবাই মিলে লড়াই করতে হবে। সেই লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই নববর্ষটা এভাবেই কাটাতে হবে আমাদের।"

একই করুণ সুর বেজে ওঠে ১৪২৭ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদকীয় 'সহমর্মী সংহতি' অংশে: "পঞ্জিকা বদলাইয়া গিয়াছে। বছরের শেষ সংক্রান্তি পার হইয়া নববর্ষ সমাগত। কিন্তু বর্ষসূচনার এমন রূপ আগে কখনও দেখা যায় নাই, আর কখনও যেন দেখিতে না হয়। সেই রূপ আনন্দের নহে, আতঙ্কের। মিলনের নহে,

XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৯ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা মঙ্গলবার ১ বৈশাখ ১৪২৭ কলকাতা

সহমর্মী সংহতি

পঞ্জিকা বদলাইয়া গিয়াছে। বছরের শেষ সংক্রান্তি পার হইয়া নববর্ষ সমাগত। কিন্তু বর্ষসূচনার এমন রূপ আগে কখনও দেখা যায় নাই, আর কখনও যেন দেখিতে না হয়। সেই রূপ আনন্দের নহে, আতঙ্কের। মিলনের নহে, বিচ্ছিন্নতার। আঁখিপল্লবের এক-সহস্রাংশ পরিমাণ ব্যাস বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরজীবীর দাপটে পৃথিবী স্তব্ধ, গৃহবন্দি। গৃহবন্দি, অবশিষ্ট ভারতের সহিত, বঙ্গবাসীর জীবনও। তাহার হালখাতা, তাহার নূতন পোশাক, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব, সকলই এই বছরটিতে স্মৃতিচারণার বিষয়মাত্র। এই দুর্যোগ কত দিনে কাটিবে, এই মুহূর্তে কেহ তাহা জানে না। সংক্রমণের ছায়া দূর হইলেও যে দুর্যোগের অবসান হইবে তাহা নহে— অর্থনীতিও প্রবল মন্দার ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই বিশ্ব জুড়িয়া যে বিপুল আর্থিক সঙ্কটের সূচনা হইয়াছে তাহা শেষ অবধি কোন অতলে পৌঁছাইবে, আমাদের জীবনে তাহার কী পরিমাণ অভিঘাত আসিয়া পড়িবে, সেই আঘাতের প্রভাব কত দিন স্থায়ী হইবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর এখন ভবিষ্যতের গর্ভে, যে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ১৪২৭ বঙ্গাব্দের নববর্ষে যেন নিদারুণ সত্য হইয়া উঠিয়াছে অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত বাংলা গানের পঙক্তি: এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার।

কিন্তু দুর্যোগ, তাহা যত ভয়ানকই হউক, কখনও শেষ কথা বলিতে পারে না। মানুষের ইতিহাস চিরকাল তমসা হইতে জ্যোতির পথ খুঁজিয়াছে, মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমৃতের সন্ধান করিয়াছে। কোথায় আলো, অমৃতকলসই বা কোথায়, তাহা না জানিলেও দমিয়া যায় নাই, উত্তরণের উপায় সন্ধানই মানুষের কাজ। এই বিপদের আবর্তে দাঁড়াইয়া দেশ ও দুনিয়ার সহিত বঙ্গসমাজকেও সেই কাজে নামিতে হইবে, নিজেকে এবং অন্য সকলকে বিপদ হইতে সুরক্ষিত রাখিবার ব্রত পালন করিতে হইবে, সঙ্কট অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার প্রস্তুতি করিতে হইবে। কাজটি কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নহে। তাহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংহতি ও সহমর্মিতা। বস্তুত, এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি গভীর। প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুস্থতা কী ভাবে অন্য সকলের উপর নির্ভর করে, গত কয়েক সপ্তাহে সংক্রমণের মোকাবিলা করিতে করিতে আমরা তাহা নূতন করিয়া শিখিয়াছি। উপলব্ধি করিয়াছি: নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য যে আচরণবিধি প্রত্যেক নাগরিককে অনুসরণ করিতে বলা হইতেছে, তাহা অন্যের সুরক্ষার জন্যও জরুরি। এই বাস্তববোধ হইতে যে সহমর্মিতা জন্ম লয় তাহাই সত্যকারের সংহতিকে প্রসারিত করিতে পারে। তাহা উপর হইতে নায়কনায়িকাদের বক্তৃতাযোগে আরোপিত সংহতি নহে, সমাজজীবনের নিজস্ব প্রয়োজন হইতে সঞ্জাত সংহতি।

ভরসার কথা, তেমন সহমর্মী সংহতির নানা লক্ষণ এই সমাজে প্রতিনিয়ত মিলিতেছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, তাহার পাশাপাশি অহরহ মিলিতেছে কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং অবিবেকী ক্ষুদ্রস্বার্থপরতার বহু বিপজ্জনক এবং লজ্জাকর নিদর্শনও। কিন্তু সেই অন্ধকারের ছায়ায় শুভবুদ্ধির আলোকচিত্রগুলি যেন নাগরিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টির অগোচর না থাকিয়া যায়। অন্য দেশের এবং অন্য রাজ্যের সহিত এই পশ্চিমবঙ্গেও এমন বহু মানুষের সন্ধান মিলিতেছে, যাঁহারা এই ক্রান্তিকালে নিজের এবং অন্যের মঙ্গলবিধানের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, অনেকেই সাধ্যাতীত কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সামাজিক স্বভাবই তাঁহাদের সেই ব্রত পালনের প্রেরণা দিয়া চলিয়াছে। প্রচলিত আচার ও আচরণের বাহিরে নিক্ষিপ্ত এ বারের নববর্ষের দিনটির যদি কোনও সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এই স্বাভাবিক সামাজিকতার উদ্‌যাপনে। নাগরিকরা আপন গৃহকোণে সংযত থাকিয়া এই সর্বমঙ্গলের সাধনায় ব্রতী হইলে দুর্যোগের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সফল হইবে। জয় হইবে মানবসমাজের।

বিচ্ছিন্নতার। আঁখিপল্লবের এক-সহস্রাংশ পরিমাণ ব্যাস বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরজীবীর দাপটে পৃথিবী স্তব্ধ, গৃহবন্দি। গৃহবন্দি, অবশিষ্ট ভারতের সহিত, বঙ্গবাসীর জীবনও। তাহার হালখাতা, তাহার নূতন পোশাক, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব, সকলই এই বছরটিতে স্মৃতিচারণার বিষয়মাত্র। এই দুর্যোগ কত দিনে কাটিবে, এই মুহূর্তে কেহ তাহা জানে না। সংক্রমণের ছায়া দূর হইলেও যে দুর্যোগের অবসান হইবে তাহা নহে— অর্থনীতিও প্রবল মন্দার ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই বিশ্ব জুড়িয়া যে বিপুল আর্থিক সঙ্কটের সূচনা হইয়াছে তাহা শেষ অবধি কোন অতলে পৌঁছাইবে, আমাদের জীবনে তাহার কী পরিমাণ অভিঘাত আসিয়া পড়িবে, সেই আঘাতের প্রভাব কত দিন স্থায়ী হইবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর এখন ভবিষ্যতের গর্ভে, যে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।”

এই অনিশ্চিত সময়ে দাঁড়িয়ে আমরাও আশাবাদী, শত সংকটে ঘুরে দাঁড়াবে গোটা পৃথিবী, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি।

নতুন বছর শুভ হোক। অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটুক। শান্তি বর্ষিত হোক সকলের জীবনে।

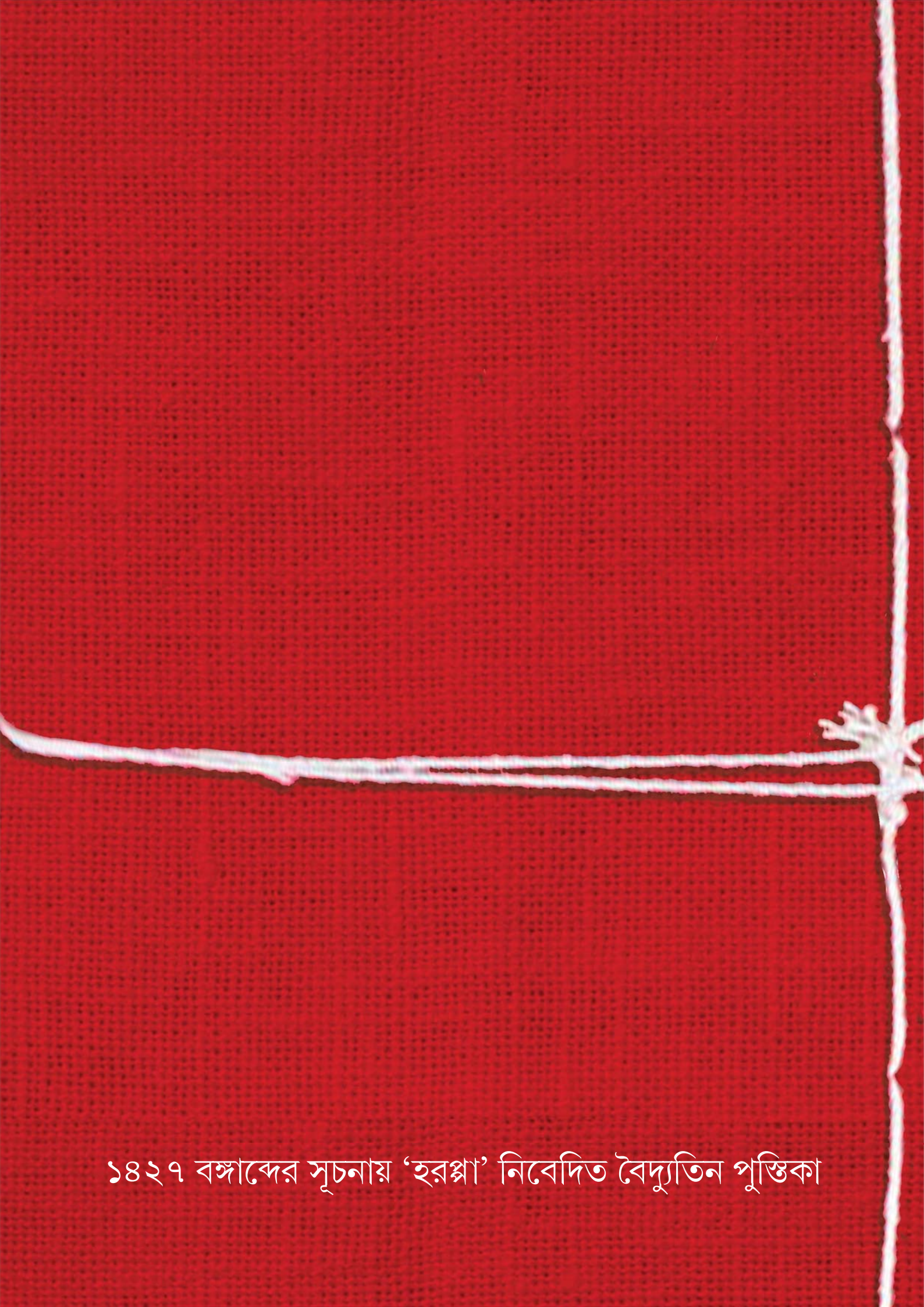

১৪২৭ বঙ্গাব্দের সূচনায় ‘হরপ্পা’ নিবেদিত বৈদ্যুতিন পুস্তিকা